অনানুষ্ঠানিক শ্রমের মিথ ও বাস্তবতা

মাইক ডেভিস

বিশ্ব পুঁজিবাদের গতিমুখ সবদেশের শ্রমজীবী মানুষকেই আরও ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। আরও অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও অনানুষ্ঠানিক খাতে পরিসর বাড়ছে, এই খাতেই নিরাপত্তাহীনভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন দেশে এই খাতের গঠন ও গতিমুখ নিয়ে একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থিত করা হয়েছে।

অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা এখন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল এক সামাজিক শ্রেণি, যার সদস্যসংখ্যা ১০০ কোটিরও বেশি। নৃতাত্ত্বিক কেইথ হার্ট ১৯৭৩ সালে 'অনানুষ্ঠানিক খাত' কথাটি প্রথম ব্যবহারের পর নগরের এই নতুন দরিদ্রদের টিকে থাকার কৌশল নিয়ে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কম লেখালেখি ও গবেষণা হয়নি। সেই ভিক্টরীয় যুগের নগর কিংবা মুৎসুদ্দি সাংহাই ও ভারতের ঔপনিবেশিক নগরগুলোতে বিশাল এক অনানুষ্ঠানিক খাতের অস্তিত্ব থাকলেও হাল আমলের সামষ্টিক অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক খাতের ভূমিকা রীতিমতো যুগান্তকারী।

একটা বিষয়ে গবেষকরা একমত, ১৯৮০-র দশকের সংকটের সময় যখন অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থান আনুষ্ঠানিক খাতের তুলনায় ২ থেকে ৫ গুণ বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন থেকেই উভয়ের কাঠামোগত অবস্থানটি উল্টে গেছে–তৃতীয় বিশ্বের বেশির ভাগ নগরে অনানুষ্ঠানিকভাবে টিকে থাকাই (ইনফরমাল সারভাইভালিজম) এখন জীবিকা অর্জনের প্রাথমিক উপায়ে পরিণত হয়েছে। এমনকি দ্রুত শিল্পায়ন হচ্ছে যে চীনে, সেখানেও নগরের দরিদ্রের টিকে থাকার উপায় হিসেবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনানুষ্ঠানিক খাতের ব্যাপক প্রসার ঘটছে। অনানুষ্ঠানিক সর্বহারার একটা অংশ নিশ্চিতভাবেই আনুষ্ঠানিক খাতেরই লুকানো শ্রমশক্তি। ওয়ালমার্টসহ বিভিন্ন মেগা করপোরেশনের সাবকন্ট্রাক্টিং নেটওয়ার্ক বস্তির দারিদ্র্যের কত গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত, সে বিষয়ে বহু গবেষণা হয়েছে।

টোডারো মডেলের মতে, অনানুষ্ঠানিক খাত হলো নগরের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের বিদ্যায়তন, যেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে গ্রামীণ অভিবাসীদের আনুষ্ঠানিক খাতে উত্তরণ ঘটবে। বাস্তবে ওপরে উঠার বদলে কেবল নিচের দিকে নামার সিঁড়িই খোলা থাকে

গবেষকরা একপর্যায়ে ষাটের দশকের প্রগতিশীল ও আধুনিকতাবাদী তাত্ত্বিকদের অতিপ্রিয় 'টোডারো মডেল'কে বাতিল বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। টোডারো মডেলের মতে, অনানুষ্ঠানিক খাত হলো নগরের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের বিদ্যায়তন, যেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে গ্রামীণ অভিবাসীদের আনুষ্ঠানিক খাতে উত্তরণ ঘটবে। বাস্তবে ওপরে উঠার বদলে কেবল নিচের দিকে নামার সিঁড়িই খোলা থাকে, যে পথ বেয়ে আনুষ্ঠানিক খাত ও সর্বজন খাত (পাবলিক সেক্টর) থেকে বাতিল ও ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকরা কালো অর্থনীতির মধ্যে গিয়ে পড়ে।

এত কিছুর পরেও অনানুষ্ঠানিকতাকে 'সক্রিয়' বেকারত্ব হিসেবে মনে নিতে অনেকেরই আপত্তি। অবশ্য জ্য ব্রেমারমানের মতো গবেষক (যিনি ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার দারিদ্র্য নিয়ে গবেষণা করেছেন) যখন সিদ্ধান্ত টানেন, অনানুষ্ঠানিক খাতে ওপরের দিকে ওঠার গল্প মূলত 'আশাবাদী চিন্তা থেকে তৈরি মিথ', তখন আত্মকর্মসংস্থান ও এনজিও প্রকল্প পূজারিদের মুখ শুকিয়ে যায়।

অন্যদিকে প্রান্তিক শ্রমিক ও কৃষি থেকে উচ্ছেদকৃত চাষিদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে সম্পত্তির বৈধ অধিকার ও অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার জন্য লালায়িত উঠতি পুঁজিপতিদের এক মৌচাক হিসেবে আখ্যায়িত করে হার্নান্ডো ডি সোটো আন্তর্জাতিক খ্যাতি কুড়িয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"মার্কস হয়তো ভীষণ ধাক্কা খেতেন এটা দেখে যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বেশির ভাগ মানুষ এখন আর শোষিত বৈধ সর্বহারা নয়, বরং শোষিত অবৈধ খুদে উদ্যোক্তা।"

ডি সোটোর উন্নয়নের বুটস্ট্র্যাপ মডেল জনপ্রিয় বিশেষত এর সহজ রেসিপির কারণে : পথ থেকে রাষ্ট্র এবং আনুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক সংগঠনগুলোকে হটাও, খুদে উদোক্তাদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ ও বস্তিবাসীদের ভূমির মালিকানা দাও; এরপর দেখো বাজার কিভাবে দারিদ্র্যকে পুঁজিতে রূপান্তর করে।

অনানুষ্ঠানিক খাত সম্পর্কিত এই ইউটোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবে অনেকগুলো পরস্পর-সম্পর্কিত জ্ঞানতাত্ত্বিক ভ্রান্তি থেকে উৎসারিত।

প্রথমত, নয়া-উদারনৈতিক তাত্ত্বিকরা নৃতাত্ত্বিক উইলিয়াম হাউজের হুঁশিয়ারি কানে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। ১৯৭৮ সালে নাইরোবির বস্তি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি মাইক্রো-অ্যাকুমুলেশন বা ক্ষুদ্র সঞ্চয়নের সাথে সাব-সাবসিস্টেন্স বা টিকে থাকার সংগ্রামের পার্থক্য করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিলেন–

"স্বল্পোন্নত দেশের নগর-অর্থনীতিকে স্রেফ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক এ দুই ভাগে ভাগ করে বোঝা যথেষ্ট নয়। অনানুষ্ঠানিক খাতকে আরো দুই উপ-খাতে বিভক্ত করা যায়– এক. মধ্যবর্তী খাত, যেখানে উদ্যোক্তাদের দেখা মেলে এবং দুই. দরিদ্র জনগোষ্ঠী, যার মধ্যে রয়েছে এক বিপুল পরিমাণ বাড়তি ও আন্ডার-এমপ্লয়েড শ্রমিক।"

আলেহান্দ্রো পোর্টেস ও কেলি হফম্যান সম্প্রতি উইলিয়াম

হাউজের অনুসরণে ল্যাটিন আমেরিকার নগরের শ্রেণি-কাঠামোর ওপর ১৯৭০-এর দশক থেকে নয়া-উদারনৈতিক অর্থনীতি ও কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচির (স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম বা স্যাপ) প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁরা সতর্কতার সাথে অনানুষ্ঠানিক পাতি বুর্জোয়া (যাদের মধ্যে রয়েছে পাঁচজনের কম শ্রমিকসম্পন্ন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ও স্বনিয়োজিত পেশাজীবী) এবং অনানুষ্ঠানিক সর্বহারার (যাদের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রমিক, গৃহকর্মী, স্বনিয়োজিত শ্রমিক) মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করেন। তাঁরা প্রায় দেশের ক্ষেত্রেই অনানুষ্ঠানিক খাতের বিকাশের সাথে রাষ্ট্রীয় খাত ও আনুষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থানের সংকোচনের সম্পর্ক দেখতে পান : ডি সোটোর বীর 'খুদে উদ্যোক্তারা' বস্তুত রাষ্ট্রীয় খাত ও আনুষ্ঠানিক খাতের ছাঁটাই হওয়া দক্ষ শ্রমিক ও পেশাজীবী। এই উদ্যোক্তারা ১৯৮০-র দশক থেকে নগরের কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০ শতাংশে পরিণত হয়, যা *"আনুষ্ঠানিক খাতের ক্রম সংকোচনের মাধ্যমে বেতনভুক কর্মীদের ক্ষুদে উদ্যোক্তায় পরিণত হতে বাধ্য করার (ফোর্সড এন্টারপ্রেনারিয়ালিজম)"* প্রবণতারই দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয়ত, তৃতীয় বিশ্বের শ্রমবাজার-বিষয়ক গবেষণায় অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মীরা প্রায় অদৃশ্য থাকে। অনানুষ্ঠানিক খাতে অংশগ্রহণকারীদের সর্বদা বীর খুদে উদ্যোক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আসলে অপরের হয়েই কাজ করে থাকে, যেমন–অপরের হয়ে পণ্য বিক্রি বা অপরের কাছ থেকে রিকশা বা ঠেলা ভাড়া করে কাজ করা।

তৃতীয়ত, 'অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান' সংজ্ঞা অনুসারেই আনুষ্ঠানিক চুক্তি, অধিকার, আইনকানুন ও দরকষাকষির ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। এই খাতের মূলমন্ত্র হলো, পাতি-শোষণ এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের ভেতরে ও আনুষ্ঠানিক খাতের সাথে বৈষম্যও ক্রমবর্ধমান। ডি সোটো কথিত অনানুষ্ঠানিক পুঁজির 'অদৃশ্য বিপ্লব' আসলে শোষণের এক অদৃশ্য জালের বিস্তার ছাড়া আর কিছুই নয়। সুরাটের ক্ষুদ্র-পুঁজিবাদ বা মাইক্রো-ক্যাপিটালিজম সম্পর্কে ব্রেমান ও অরবিন্দ দাস লিখেছেন–

"নগ্ন শ্রম শোষণ ছাড়াও অনানুষ্ঠানিক খাতের বৈশিষ্ট্য হলো–কাঁচা প্রযুক্তি, পুঁজি বিনিয়োগের নিম্ন হার, উৎপাদনের ক্ষেত্রে শারীরিক শ্রমের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ইত্যাদি। সেই সাথে নিবন্ধিত না হওয়ায় এবং করের আওতার বাইরে থেকে যাওয়ায় এই খাতে মুনাফার হার ও পুঁজি সঞ্চয়ের পরিমাণও বেশি। এই খাতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অর্থপূর্ণ ছবিগুলোর একটি হলো আবর্জনার দোকানের ভদ্রলোক-জাতীয় মালিকের ছবি। ইস্ত্রি করা কাপড় পরে তিনি চকচকে মোটরসাইকেল চড়েন আর ময়লা সংগ্রহকারীরা আবর্জনার স্তূপ থেকে তাঁর মুনাফার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী খুঁজে খুঁজে বের করে–হ্যাঁ, আক্ষরিক অর্থেই আবর্জনা থেকে তৈরি হয় সম্পদ।"

চতুর্থত, অনানুষ্ঠানিকতা নারী ও শিশুর ওপর চরম নিপীড়নের পরিবেশ তৈরি করে। আবারও ব্রেমানের কথা চলে আসে, তিনি ভারতের দরিদ্রদের ওপর করা তাঁর দুর্দান্ত গবেষণায় দেখিয়েছেন–

"লোকচক্ষুর আড়ালে, দুর্বলতম ও ক্ষুদ্রতম কাঁধেই অনানুষ্ঠানিকতার কঠিনতম ভারগুলো বহনের দায় চাপে।"

পঞ্চমত, অনানুষ্ঠানিক শ্রমের সপক্ষের তাত্ত্বিকরা দাবি করেন, অনানুষ্ঠানিক খাতে নতুন নতুন শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। অথচ ফ্রেডরিখ থমাস কলকাতায় এ বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছেন, বিদ্যমান কাজ স্রেফ খণ্ড খণ্ড হয়, যার ফলে আয়ও বিভক্ত হয়ে কমে যায় :

"যে কাজ একজনে করতে পারে, সেই কাজ তিন-চারজনে মিলে করে, নারী বিক্রেতারা সামান্য কিছু ফল ও সবজি নিয়ে সারা দিন বাজারে বসে থাকে, নাপিত ও জুতা পালিশওয়ালা সারা দিন রাস্তার পাশে বসে থেকে অল্প কয়েকজন খদ্দেরের কাজ করতে সক্ষম হয়, শিশু-কিশোররা ট্রাফিক জ্যামের ফাঁক গলে ম্যাগাজিন, সিগারেট কিংবা টিস্যু বিক্রি করে, গাড়ির জানালা পরিষ্কার করে, নির্মাণ শ্রমিক সকাল থেকে কাজের আশায় দাঁড়িয়ে থাকে–কখনও কাজ পায়, কখনও পায় না..."

যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত শ্রম অনানুষ্ঠানিক খাতের উদ্যোক্তায় রূপান্তরিত হয়, তা অনেক সময় বিস্ময়কর। ১৯৯২ সালে দার-এস-সালামে করা এক জরিপে দেখা যায়, নগরীর দুই লাখেরও বেশি খুদে বিক্রেতা আসলে ঐহিত্যবাহী মামা লিশে (নারী খাদ্য বিক্রেতা) নয়, স্রেফ বেকার তরুণী। গবেষকরা লিখেছেন,

"সাধারণত অনানুষ্ঠানিক খাতের খুদে ব্যবসা হলো অর্থনৈতিকভাবে বিপদাপন্ন নগরবাসীর টিকে থাকার একেবারে শেষ উপায়।"

> পানিতে কোনো রকম ভেসে থাকার মতো নগরে টিকে থাকতে সহায়তা করলেও সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচনে এসব উদ্যোগের তেমন কোনো অবদান নেই; এমনকি গ্রামীণ ব্যাংকের জন্ম যে দেশে, সেই দেশের নগর ঢাকার ক্ষেত্রেও নেই।

তাছাড়া অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক খাতের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলো পরস্পরের সাথে সর্বদাই অর্থনৈতিক যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, যেমন–হকার বনাম ছোট দোকানদার। ব্রায়ান রবার্টস একুশ শতকের শুরুতে ল্যাটিন আমেরিকা সম্পর্কে বলেছিলেন,

"অনানুষ্ঠানিক খাত বড় হচ্ছে, কিন্তু এর মধ্যে আয় ক্রমশ কমছে।"

অনানুষ্ঠানিক খাতে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা এত তীব্র যে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের প্রাণিকুলের টিকে থাকার সংগ্রামকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডারউইন যে বিখ্যাত উপমা দিয়েছিলেন, তার কথা স্মরণ করা যেতে পারে–

"দশ হাজার ধারালো কিলককে একত্রে রেখে একের পর আঘাত করে ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা। কখনও যদি একটা ঢুকে যায়, পরবর্তীটা ঢোকানোর জন্য আরো জোরে আঘাত করতে হয়..."।

মাথাপিছু আয় হ্রাস এবং/অথবা শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধির বিনিময়েই কেবল নতুন একজন অনানুষ্ঠানিক খাতে ঢুকতে পারে।

ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের সময়ও নগরগুলো কৃষি থেকে উচ্ছেদ হওয়া গ্রামীণ শ্রমিকদের সবাইকে ধারণ করতে সক্ষম ছিল না। কিন্তু আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের গণ-অভিবাসন অনেকটা সেফটি ভাল্‌ভ হিসেবে কাজ করে, যার ফলে মেগা-ডাবলিন বা সুপার-নেপলস তৈরি হওয়ার মতো পরিস্থিতি

এড়ানো গেছে এবং দক্ষিণ ইউরোপে দারিদ্র্যায়ণের ফলে জন্ম নেওয়া নিম্নবর্গের নৈরাজ্যও ছড়িয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে তৎকালীন ইউরোপ। অথচ আজ উদ্বৃত্ত শ্রমিকরা ধনী দেশে অভিবাসন করতে চাইলে নজিরবিহীন বাধার সামনে পড়ছে।

ষষ্ঠত, অবাক হওয়ার কিছু নেই–এই রকম বেপরোয়া পরিস্থিতিতে নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী নগরে টিকে থাকার তীব্র বাসনা নিয়ে 'তৃতীয় অর্থনীতি'র মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, যার মধ্যে রয়েছে জুয়া, লটারি, পিরামিড স্কিম ইত্যাদি। ব্যাংককের ক্লঙ্ক থোয়ে বস্তিতে চালানো এক জরিপ অনুসারে, বস্তির আয়ের ২০ শতাংশই বিভিন্ন জুয়া ও খেলার মাধ্যমে পুনর্বণ্টিত হয়। এছাড়া তৃতীয় বিশ্বের নগরগুলো জুড়ে চলে ধর্মীয় ভক্তির মাধ্যমে ভাগ্য ফেরানোর নানান কসরত।

সপ্তমত, এতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই যে এরকম একটা পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্রঋণ বা সমবায়ের মাধ্যমে ধার ইত্যাদি উদ্যোগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোকে পানিতে কোনো রকম ভেসে থাকার মতো নগরে টিকে থাকতে সহায়তা করলেও সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচনে এসব উদ্যোগের তেমন কোনো অবদান নেই; এমনকি গ্রামীণ ব্যাংকের জন্ম যে দেশে, সেই দেশের নগর ঢাকার ক্ষেত্রেও নেই। লিমার অভিজ্ঞ সমাজকর্মী জেমস জোসেফ লিখেছেন, আসলে খুদে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের ধারণাটা অনেক কল্যাণকামী এনজিওর কাছেও অনেকটা শহুরে ধর্মীয় প্রথায় (আরবান কার্গো কাল্ট) পরিণত হয়ে গেছে :

"নগরের দরিদ্রদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জাদুকরি সমাধান হিসেবে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের ওপর তো কম জোর দেওয়া হলো না। গত ২০ বছরে ছোট ব্যবসা নিয়ে আমাদের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, এগুলো স্রেফ কোনো রকমে টিকে থাকার উপায় হিসেবে কাজ করে; এসব থেকে পুঁজি গড়ে ওঠার সুযোগ নেই বললেই চলে।"

অষ্টমত, অনানুষ্ঠানিক খাতের ভেতরকার ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা সামাজিক পুঁজির ক্ষতি করে, পরস্পরের মধ্যকার সহযোগিতা ও সংহতির সম্পর্ক নষ্ট করে, যা অতিদরিদ্র বিশেষত নারী ও শিশুদের টিকে থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। ইয়োলেত্তি এতিয়েনে নামে হাইতির এক এনজিওকর্মী পরম দারিদ্র্যায়ণের প্রেক্ষাপটে নয়া-উদারনৈতিক ব্যক্তিবাদের ফলাফল বর্ণনা করেন :

"এখন সবকিছুই বিক্রির জন্য। একসময় নারীরা অতিথি আপ্যায়ন করত, কফি দিয়ে স্বাগত জানাত, ঘরে যা আছে তা-ই ভাগাভাগি করে নিত। আমি প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে এক থালা খাবার চেয়ে নিতে পারতাম, একটি শিশু তার দাদির কাছ থেকে নারকেল নিতে পারত আর খালার বাড়ি থেকে দুটো আম। দারিদ্র্য বাড়ার সাথে সাথে এইসব সংহতি ও সহযোগিতার সম্পর্ক বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এখন কোথাও গেলে সেই নারী আপনার কাছে কফি বিক্রি করতে চাইবে অথবা তার কাছে কোনো কফিই পাবেন না। পারস্পরিক আদান-প্রদানের যে সম্পর্ক এতদিন আমাদের টিকিয়ে রেখেছিল, তার প্রায় সবই এখন হারিয়ে গেছে।"

নবমত, এরকম একটা পরিস্থিতিতে শ্রমকে আরো নমনীয় (ফ্লেক্সিবল) করার নয়া-উদারনৈতিক ব্যবস্থাপত্রের ফলাফল স্রেফ মহাবিপর্যয়কর। শ্রমশক্তির অনিঃশেষ সরবরাহের বাস্তবতায় অনানুষ্ঠানিক খাতের তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদেরকে সকলের বিরুদ্ধে একরকম যুদ্ধেই লিপ্ত হতে হয় : এই রকম পরিস্থিতিতে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সাধারণত ধর্মীয় ও জাতিগত সন্ত্রাসে রূপান্তরিত হয়। অনানুষ্ঠানিক খাতের গডফাদার ও ল্যান্ডলর্ডরা প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ ও নিজেদের বিনিয়োগের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সন্ত্রাস ও নিপীড়নকে বেশ চতুরতার সাথে ব্যবহার করে। এ বিষয়ে ফিলিপ অ্যামিজ লিখেছেন :

"অনানুষ্ঠানিক খাতের তুলনামূলক সফল শাখাগুলোতে প্রবেশের ক্ষেত্রে পুঁজির সংকট ও রাজনৈতিক বাধা থাকে; যার ফলে এক ধরনের একচেটিয়া প্রবণতা তৈরি হয়। এইসব খাতে নতুন কারো পক্ষে ঢোকা বেশ কঠিন।"

রাজনৈতিকভাবে দেখলে, কার্যকর শ্রম আইনের অনুপস্থিতির মধ্যে অনানুষ্ঠানিক খাত ঘুষ, গোষ্ঠী আনুগত্য আর জাতিসত্তার বিবেচনায় গ্রহণ/বর্জনের মাধ্যমে তৈরি সামন্ত্রতান্ত্রিক ধাঁচের এক জগৎ। নগরে কোনো স্থানই বিনা মূল্যের নয়। ফুটপাতে একটুকরো জায়গা, ভাড়ার বিনিময়ে রিকশা, নির্মাণকাজের দিনমজুরি কিংবা বাসাবাড়ির কাজ পাওয়া–সবকিছুই কোনো না কোনো নেটওয়ার্কের আওতাধীন পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে জোগাড় করতে হয়। প্রচলিত আনুষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থান যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন ও বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের সহায়তায় জাতিগত/আঞ্চলিক ভিন্নতা অতিক্রম করে শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পারিক সংহতি বাড়ানোর ভূমিকা রাখে, সেখানে অনানুষ্ঠানিক খাতের উত্থানের সাথে প্রায়শই ধর্মীয় ও জাতিগত বিভেদ ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতের যোগসূত্র দেখা যায়।

[লেখাটি মাইক ডেভিসের 'প্লানেট অব স্লামস' গ্রন্থের (২০০৭, ভারসো, লন্ডন) 'মিথ অব ইনফরমালিটি' অংশ অবলম্বনে তৈরি। সর্বজনকথার জন্য অনুবাদ করেছেন কল্লোল মোস্তফা]